যাত্রী

অমিত ভট্টাচার্য

দমদম থেকে মেট্রোরেলে পার্কষ্ট্রিট পৌঁছতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগে। তবে আজকাল রোজই কোন না কোন গন্ডগোল লেগেই আছে। হয় দরজা বন্ধ হচ্ছে না, নয় কোন মেকানিকাল ফল্ট। বিজু স্টেশনে আসে ঠিক নটায়। নটা দশের ট্রেনটা ধরতে না পারলে ভীষণ ঠেলাঠেলি লেগে যায়। তার ওপর সামনে পূজো। এ সময় রাস্তা ঘাটের ভিড় দেখলে মনে হয় যেন সব বাড়িতেই তালা ঝুলছে। এই ভিড় ভাট্টা ওর পক্ষে একটু অসুবিধের। তাছাড়া বিজুর ধারণা যারা সকাল সকাল অফিস বেরোয় তারা একটু ধীর স্থির। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে যেতেও ওর সুবিধা হয়। কখনো কখনো ওদের কেউ সিট ছেড়ে বিজুকে বসতেও বলে, বিজু বসে না।

রোজই কোথাও যাওয়া আসা করলে কারো কারো সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সময়ে দেখা হয়ে যায়। সেভাবে পরিচয় না থাকলেও সে ঠিক অপরিচিত থাকে না। অনেক সময় তাকে নিয়ে যা হোক কিছু কল্পনাও দানা বাঁধে। ঐ যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, রোজ বিজুর সংগে যায়। দেখে কেমন দুখী দুখী লাগে। মাথায় চুল একটু কম। অল্প বয়সেই বাবা গত হয়েছে বোধহয়। তাঁর চাকরিটাই পেয়ে থাকবে। সংসারে হয়ত ওই বড়। বিয়ে থা দেবার কেউ থাকলে নিশ্চয়ই বিয়ে হয়ে যেত।

সানগ্লাস বাবু এসে গেছে। মেট্রোর কুড়ি ইঞ্চি দেওয়ালের ভেতর টিউব লাইটের তলায় দাঁড়িয়ে রোদ চশমা খুলতে ভুলে যায়। নতুন ব্যবসা ফেঁদেছে নিশ্চয়ই। কামাই কিছু হলেও একটু বেশী আত্মতুষ্ট মনে হয়।

বাংলা গানের যন্ত্রসংগীত বাজাতে বাজাতে ট্রেন এসে দাঁড়ালো। ওমনি শু হয়ে গেল মিউজিক্যাল এবং রাগবির মাঝামাঝি একটা খেলা। যেভাবে হোক সকলেরই সিট চাই। যারা চেষ্টা করেও বিফল হল, তারা একটু বেশী লজ্জা পেল। কিছু আসে যায় না। আবার কাল দেখা যাবে। রোজের পাওয়া লজ্জার রেশ কম। বিজু সামনের কামরায় উঠে দরজার ডানদিকে একটু সরে দাঁড়ালো।-- "ওয়েল কাম টু মেট্রো। উইস্ ইওর হ্যাপি জার্নি।" এই বাণী দিয়েই প্রান্তিক স্টেশনের যাত্রা শু হয়। পাশের লোকটির চশমায় কার ধাক্কা লেগে ডান্ডিটা একটু বেঁকে গেছে। সেটা সে ঠিক করতে করতেই বেলগাছিয়া। এদিকের দরজায় একটু বাঁচোয়া। এখান থেকে পার্কষ্ট্রীট পর্যন্ত সব স্টেশনেরই দরজা খুলবে উল্টোদিকে। দরজা খুলে আবার বন্ধ হল। মাত্র দুজন উঠল। একজন তণের সংগে তার বাবা। ছেলেটি উঠেই বই খুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল। নির্ঘাত কোন পরীক্ষার্থী। সামনে বসা লোকগুলো দেখেও তাকে দেখছে না। তার বাবা একহাতে রড অন্যহাতে ছেলেটিকে খুঁটির মত ধরে আছে। যাতে পড়ে না যায়। আগেকার দিনে ছেলেরা বাপের খুঁটি হত। এখন বাবারা। তাই বোধহয় সন্তান জন্মের সময় আর কেউ ছেলে ছেলে করে না।

এই খুঁটি হওয়ার ইচ্ছেতে অনেক বাবাকে মাশুলও গুনতে হয়। বিজুদের পুরোনো বাড়িওয়ালাই তো জীবিতাবস্থায় একমাত্র ছেলেকে ছোট করে রেখেছিল। বলত "রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, চলা ফেরা করাই বিপদের। ছেলে আমার যা ভোলাভালা ও পারবে না এসবের হেপা পোয়াতে।" তারপর একদিন চোখ বুজল শুধু ছেলেটাকে বয়েসে বড় করে।

মাথার উপর থেকে ঘোষণা--"পরবর্তী স্টেশন গিরীশ পার্ক"। আওয়াজটা শুনে ছোটবেলায়, সিগারেটের চিন কাগজে ঠোঁট রেখে কথা বলার স্মৃতি ভেসে উঠল বিজুর। পাশের বাড়ির শম্ভু ছিল বয়সে বিজুর থেকে দু-চার বছরের বড়। একবার বাবার সিগারেট প্যাকেটের শেষ দুটো সমেত গ্যাড়া মেরেছিল সে। একদিন তাদের ছাদের কোণে বিজুকে ডেকে নিয়ে গিয়ে, দাতা কর্ণের মত একটা নিজে ধরিয়ে অন্যটা বিজুর ঠোঁটে গুজে দিল। শর্ত ছিল বিজু সিগারেট ধরালে প্যাকেটের চিন কাগজটা পাবে। কে জানে, ঐ চিন কাগজের ওপর কেন এত লোভ ছিল তার। সুযোগটা সে ছাড়তে পারেনি। কিন্তু দুটো টান দিতেই কাশতে কাশতে সেদিন তার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। পরক্ষণেই তেতো ঠোঁট আর চোখে জল নিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল শম্ভুর দিকে। চিন কাগজটা পেয়ে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ পাওয়ার ভঙ্গিতে হেসেছিল বিজু। এরপর অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে ছিঁড়ে ঠোঁটে লাগিয়ে গান হল। সেদিনই বাড়ি ফিরে বিজু তার ছোটবোনকে পেয়ারা গাছ থেকে পেয়ারা পাড়ার প্রস্তাব দিতেই বোন দৌড়ে গিয়ে মার কাছে নালিশ জানিয়ে এল। 'মা মা দাদার মুখে না বাবার মত গন্ধ।' এর আগে কোনদিনও মার কাছে বিজু এত বকা খায়নি।

" স্টেশন গিরীশ পার্ক, প্ল্যাটফর্ম ডানদিকে"। দরজা খোলার সংগে সংগেই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো লোকটির সংগে চোখাচোখি হয়ে গেল বিজুর। সংগে সংগেই সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু সেই সংগে সত্তর দশকের ভয়াবহ দিনগুলো থেকে তার মন ঘোরাতে পারল না। সেদিনের সেই গুরুই আজ কাপ্তেন হয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে। যার লেকচারে ঝাঁপ দিয়ে মানুষের মুক্তির পথ সুগম করতে চেয়েছিল বিজু। আর সেজন্যই তার নিজের পথ আজ দুর্গম। শালা পুলিশের বন্দুকেও এত টিপ! এ গলি সে গলি দৌড়ে শেষে মনুদের পাঁচিল টপকাবার আগেই হঠাৎ পায়ে এসে লাগল সারাজীবনের অভিশাপ। তাতেও কোন আক্ষেপ ছিল না। কিন্তু যার উপদেশে নিজের জীবন বিপন্ন করতেও দ্বিধা করেনি, সে কিনা শেষমেষ বিয়ে করে বসল সেই পুলিশেরই এক বড় কর্তার মেয়েকে!

মহাত্মা গান্ধী রোড স্টেশনে ঢোকার আগেই বিজুর মন একটা আশায় দুলতে থাকে। শুধু একটু দেখার অপেক্ষায়। মনে মনে শাড়ীর রঙ-ও কল্পনা করে সে। বেগুনী, হলুদ, রানী নাকি পিংক! খুবই মার্জিত চেহারা। চোখদুটো যেন বহুপ্রতীক্ষায় স্নাত। তারই আভাস ঘন অক্ষিপক্ষযুগলে। চুলের রঙ-ও ভেজা কয়লার মত। ঠোঁট দুটো ঠিক সদ্য ফোটা গোলাপ। উন্মুক্ত পায়ের গোড়ালি দুটো চলার কষ্টে বোধহয় অমন লালচে হয়ে থাকে। কোনদিন দেখা হয়, কোনদিন হয় না। এই অনিশ্চয়তাই বিজুর প্রিয়। তবু দেখা হলে দিনটা তার ভালই কাটে। আড়াল করে দেখতে দেখতে কখনও চোখে চোখ পড়ে যায়। সে সময় বিজুর মনে হয় যেন কোন অন্তর্যামিনী তার মন পড়ে ফেলল। মেয়েটি আবার তাকায়। বিজুও। এভাবেই মাত্র বারকয়েকের লেনদেন পুঁজি যায় সারাদিনের। উঠতে বসতে ফ্লাশব্যাকের আনন্দে বুক ভরে ওঠে। এরকম মুহূর্তে বিজু নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখেছে, সে যেন একটু বেশী উদার এবং সহানুভুতিশীল হয়ে পড়ে। সে যার জন্যই হোক। কিন্তু আজ মেয়েটি উঠল না। ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার আগে, ফাঁকা স্টেশনের আনাচে কানাচে, যতদূর যায়, বিজুর চোখ আকুপাকু করে খুঁজেও যখন তাকে পেল না, তার মন তাকে সান্ত্বনা দিল- এই ট্রেনেই আছে, অন্য কোন কামরায়।

সকালে অফিস যাওয়ার তাড়াহুড়োয় ঠিক করে কাগজ পড়া হয় না। তাই অনেক খবরই অফিস যেতে যেতে ট্রামে বাসে বা ট্রেনেই পাওয়া হয়ে যায়। যেমন এখন চাঁদনিচক থেকে একজন উঠে পড়ে আলোচনা করছে কোন্ কোন্ কাগজে তাদের সহকর্মীর মেট্রোতে আত্মহত্যার খবর ছেপেছে। আহারে; বেচারি নাকি দুই মেয়ের বাবা। স্ত্রীর অসুখে জেরবার স্বামী প্রচুর টাকা ধার করে। কিন্তু শোধ করার সুযোগ ছিল না। তাই শেষে ঐ পথ বেছে নিয়েছে গতকাল। এমন হার স্বীকারের গল্প আকছার শোনা যায় আজকাল। কিন্তু শুধু মৃত্যুকে মেনে এমন হার স্বীকারে সত্যিই কী জীবিতদের কোন সহানুভুতি থাকে? আত্মবিসর্জনের আগের মুহূর্তে আত্মহত্যাকারীর নিশ্চয়ই শুধু তার নিজের কথাই ভাবে স্বার্থপরের মত। কিন্তু যারা বেঁচে থাকবে? যাদের জন্য তার এতদিনের ত্যাগ স্বীকার, তাদের কী হবে? সে কথা ভাবলেও তো মৃত্যুইচ্ছা দমানো যায়। আরে বাবা, এ তো আর লিমিটেড ওভারের খেলা না। তাহলে শেষদিন পর্যন্ত মানুষের লড়ার আগ্রহ নেই কেন! বিজু

কিছুতেই তা ভেবে পায় না। দলটির কথাবার্তা শুনে কেউ কেউ বেশ কৌতূহলী। বিশেষ করে মহিলারা হাহুতাশও শু করে দিয়েছে।

এসপ্লানেড স্টেশনে যে কজন উঠল, তাদেরই একজন বিজুর ঠিক ডানদিকে স্টিকার লাগানো প্রতিবন্ধী সিটের সামনে দাঁড়িয়ে বসে থাকা এক ভদ্রলোককে উঠতে বলল।

-- কেন? আপনি কি প্রতিবন্ধী?

-- আজ্ঞে হ্যাঁ।

সিটের ভদ্রলোকের চোখে তখনও অবিশ্বাস। দাঁড়ানো ভদ্রলোক সেকথা বুঝে, পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে বলল, "এই দেখুন আমার ডিস্‌এবিলিটির কার্ড। আমি একজন লিগালি ব্লাইন্ড পারশন্‌।" কিছুটা উপায়হীন হয়েই সিটের ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। প্রতিবন্ধী ভদ্রলোকটি নিজের জয়ে গর্বিত হয়েই সিটে বসে, একটা বই ব্যাগ থেকে বার করে প াঠরত হোল। ব্যাপারটা সকলেই উপভোগ করল। অনেকের ঠোঁটেই তখনও হাসি লেগে আছে। হঠাৎ বিজুর হাত থেকে ফসকে তার ত্রাচটা গিয়ে পড়ল আইনসঙ্গত অন্ধ লোকটির কোলে। ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকিয়ে সংগে সংগে উঠে সেটি বিজুর হাতে আবার দিয়ে বলল, "সরি আপনাকে ঠিক লক্ষ্য করিনি।" --" স্টেশন পার্কস্ট্রিট, প্ল্যাটফর্ম বাঁদিকে।" ঘোষণ ার সংগে দরজা খুলে গেল। বিজু ত্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্লাইন্ড ভদ্রলোক শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সেদিকে চেয়ে রইল। পেছন থেকে কে একজন বলে উঠল, "দাদা কি দেখতে পাচ্ছেন?"

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com